জীবনে যা দেখলাম

তৃতীয় খণ্ড (১৯৬২-১৯৭২)

[৯ খণ্ডে সমাপ্ত]

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন - ঢাকা

সূচিপত্র

একটি কৈফিয়ৎ /১৩
ঢাকা শহরে অন্তরীণ হলাম /১৩
অন্তরীণাদেশ প্রত্যাহার /১৪
দেওয়ান আবদুল বাসেতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক /১৪
নাখাল পাড়ায় জামায়াতের প্রাদেশিক অফিস স্থাপন /১৫
ব্যাপক সাংগঠনিক সফর /১৬
লাহোরে নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন ১৯৬৩ /১৬
সম্মেলন পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন /১৮
সম্মেলনের কার্যক্রম /১৮
লাহোর সম্মেলনের ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি /২০
মজলিসে শূরায় মাওলানার নিরাপত্তা ইস্যু /২০
১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে জামায়াত বেআইনী ঘোষিত /২১
লাহোর জেলে পৌঁছলাম /২২
মাওলানার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দু'মাস /২৩
মাওলানার দারস /২৪
জেলে আমার ব্যক্তিগত কর্মসূচি /২৪
নাশতা ও খাবার উৎসব /২৫
জেলে রোযার মাস /২৭
লাহোর জেলে মজলিসে শূরার অধিবেশন /২৭
একটি ছোট্ট ঘটনা /২৯
বিচারপতির সামনে হাজির হলাম /৩০
ঢাকা রওয়ানা /৩০
ঢাকা জেলে পৌঁছলাম /৩২
জেলে স্থান পরিবর্তন /৩৩
জেলে পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ /৩৪
ঢাকা জেলে সাড়ে পাঁচ মাস /৩৫
আটকাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির অমানবিক পদ্ধতি /৩৫
জেলে আমরা ৪ ভাই /৩৬
কারাগার নয়; শিক্ষাগার /৩৬
জেলে অধিকার আদায় /৩৭
কারাগারের হাসপাতালে /৩৮
জেল থেকে মুক্তি /৩৯

সামরিক শাসক মি. ভুট্টো /২৫১
দুটো বড় সমস্যা /২৫১
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন /২৫৪
মাওলানা মওদূদী ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন /২৫৫
আমীরে জামায়াতের নির্বাচন পদ্ধতি /২৫৫
নির্বাচনের জন্য প্যানেল গঠন /২৫৬
পাকিস্তানে আমার ব্যাপক সফর /২৫৭
আমার লন্ডন যাবার প্রচেষ্টা /২৫৮
পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব /২৫৯
আযাদ-কাশ্মীর সফর /২৬০
রেডিও থেকে আমার বক্তৃতা /২৬২
প্রেসিডেন্টের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ /২৬২
চীফ-সেক্রেটারির সাথে ইসলামাবাদে সাক্ষাৎ /২৬২
পাকিস্তান থেকে বের হবার ধান্দা /২৬৫
হজ্জের প্রস্তুতি /২৬৬
এ খবরের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া /২৬৮
মাওলানা কাওসার নিয়াজী /২৬৯
কাওসার নিয়াজীর অধঃপতন /২৭০
মি. ভুট্টোর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ গমন /২৭২
আমার নাম ভুলবার রোগ /২৭২
মি. ভুট্টোর সাথে সাক্ষাৎ /২৭৪
মাওলানা মওদূদীর সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ /২৭৬
মাওলানা থেকে বিদায় নিলাম /২৭৭
স্টিমারে আরোহণ /২৭৮
স্টিমারে ৭ দিন /২৮০
স্টিমারে আমার প্রথম বক্তৃতা /২৮১
দ্বিতীয় বক্তৃতা /২৮২
ইয়ালামলামে ইহরাম বাঁধা /২৮২
জেদ্দা বন্দরে অবতরণ /২৮৩
মক্কায় মুআল্লিমের আস্তানায় /২৮৪
বাংলাদেশ থেকে আগত হাজী /২৮৫
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সাংগঠনিক উদ্যোগ /২৮৭
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর জন্য আমার করণীয় /২৮৮

৯১.

একটি কৈফিয়ৎ

আত্মজীবনী লেখার আমার কোন পরিকল্পনা ছিলো না বলে 'আমার জীবনে যা দেখলাম' তার রেকর্ড রাখিনি। স্মৃতিসাগর মন্থন করেই আমাকে লিখতে হচ্ছে। রাজনৈতিক তথ্যাবলি কয়েকটি বই থেকে সংগ্রহ করি। আর বাকি সবই স্মৃতির উপর নির্ভর করে লিখি।

১৯৩০ সালে যখন আমার বয়স ৮ তখন থেকে লেখা শুরু করে আমার লেখা এ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে পৌঁছেছে। কিন্তু স্মৃতিনির্ভর হওয়ায় কোন বিষয় বাদ পড়ে গেলে আবার পেছনের কথাও উল্লেখ করা হয়। ১৯৬২ সালের বিশেষ একটি বিষয় উল্লেখ করছি, যা আগে লেখা হয়নি।

ঢাকা শহরে অন্তরীণ হলাম

১৯৬২ সালের এপ্রিলে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের পর সরকার আমার চলাফেরার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলো। ঢাকা শহরের বাইরে আমার যাওয়া নিষিদ্ধ করা হলো। কারণ, ১৯৬১ সালে আইয়ূব খান ইসলামের পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে যে অর্ডিন্যান্স জারি করেন, এর বিরুদ্ধে আমি কুরআন ও হাদীসের যুক্তি দিয়ে তীব্র প্রতিবাদমূলক বক্তব্য রাখতাম। বিভিন্ন জেলা-শহরের জনসভায় এ বিষয়ে আমার বক্তৃতা বন্ধ করাই সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো।

মাওলানা মওদূদীর উদ্যোগে পশ্চিম-পাকিস্তানের ১৪ জন নেতৃস্থানীয় আলেমের বিবৃতি উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করে পূর্ব-পাকিস্তানের আলেমগণের দস্তখত সংগ্রহ করে পুস্তিকাকারে প্রচার করা হয়। ইসলামের পারিবারিক আইনের উপর এ জঘন্য হামলার প্রতিবাদে উক্ত বিবৃতিতে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয় যে, আইয়ূব খানের ফ্যামিলি ল' অর্ডিন্যান্স কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিরোধী।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে জনাব আব্বাস আলী খান এ অর্ডিন্যান্স বাতিলের জন্য বিল পেশ করেছিলেন। কিন্তু আইয়ূব খানের অনুগত মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি এ বিলের উপর আলোচনা করতেই দেয়নি।

ঢাকা শহরে অন্তরীণ করার আগে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিয়ে আমাকে একটি প্রশ্নমালা দিলো। প্রশ্নগুলোর মধ্যে বেশ ক'টি নীতিগত থাকায় আমি জওয়াব দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। দেশের আইন ও শাসন সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ হিসেবেই আমি লিখিত বক্তব্য পেশ করলাম। প্রশ্নগুলো ইংরেজিতে ছিলো বলে জওয়াবও ইংরেজিতে দিলাম। আমার

জওয়াবের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সরকারের পক্ষ থেকে আমার নিকট পৌঁছেনি। আমি অনুভব করলাম যে, সরকার সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও আদর্শবাদী লোকের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চায় না। শক্তি প্রয়োগ করে আদর্শের প্রতিরোধ করাই সরকারি নীতি। আমি যা লিখেছি, তা খণ্ডন করা সম্ভব নয় বলে আমাকে জনগণের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার কুমতলবে আমার উপর অন্তরীণাদেশ জারি করা হলো।

আমার কর্মস্থল ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো। জনসভায় বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। তবে ঢাকা শহরে আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। অবশ্য সব সময় তাদের কেউ আমার পেছনে লেগে থাকতো। আমি প্রতি শুক্রবারে বিভিন্ন বড় মসজিদে বক্তব্য পেশ করতাম। সপ্তাহে দু'টো মসজিদে দারসে কুরআন অব্যাহত ছিলো।

অন্তরীণাদেশ প্রত্যাহার

প্রাদেশিক আইন সভায় মাওলানা আবদুস্ সুব্হান বিরোধী দলের ডিপুটি লিডার ছিলেন। দেওয়ান আবদুল বাসেত লিডার অব দি হাউজ ছিলেন। ১৯৬৩ সালে মাওলানা আবদুস্ সুব্হান আইন পরিষদে আমার অন্তরীণাদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, "চোর, ডাকাত ও দুষ্ট লোকদের দমন করার সাধ্য সরকারের নেই। কিন্তু অধ্যাপক গোলাম আযমের মতো চরিত্রবান ও আদর্শবাদী লোককে ঢাকা শহরে আটক করে রাখার কী যুক্তি থাকতে পারে? তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা অন্তরীণাদেশ কেন অব্যাহত রাখা হয়েছে, তা দেশবাসী জানতে চায়।"

লিডার অব দি হাউজ দেওয়ান আবদুল বাসেত সঙ্গে সঙ্গে জওয়াবে বললেন, "আমি অবিলম্বে এ বিষয়টা দেখবো এবং আগামীকালই হাউজে এ বিষয়ে বক্তব্য দেবো।" পরের দিন দেওয়ান বাসেত পরিষদের বৈঠকের শুরুতেই ঘোষণা করলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযমের উপর থেকে সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।" যদি আইন পরিষদে আমার পক্ষে কথা বলার কেউ না থাকতো তাহলে হয়তো ঐ নিষেধাজ্ঞা অনেকদিন বহাল থাকতো।

দেওয়ান আবদুল বাসেতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

দেওয়ান সাহেবের বাড়ি মৌলভীবাজার। আমি সাংগঠনিক সফরে সেখানে গেলাম। দেওয়ান সাহেব আমার সাথে দেখা করে তাঁর বাড়ি যাবার দাওয়াত দিলেন। সন-তারিখ মনে নেই। তখন তিনি সরকারি দায়িত্বে ছিলেন না। কথা-বার্তায় এমন শরীফ মানুষ কমই দেখা যায়। দেখতেও অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। মন্ত্রী থাকাকালেও তাঁর দাড়ি ছিলো। গায়ের রংও ছিলো উজ্জ্বল ফর্সা। তিনি এমন মহব্বতের সাথে দাওয়াত দিলেন যে, সাথে সাথেই কবুল না করে পারলাম না। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক এভাবেই শুরু হলো এবং এর উদ্যোগ তাঁরই। আমি মৌলভীবাজার গেলে এবং তিনি বাড়িতে থাকলে তাঁর বাড়িতে যেতেই হতো।

১৯৭৪ সালে তিনি মক্কা শরীফ যেয়ে স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টা করেন। তখন আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবন চলছে।

আমার অবস্থান লন্ডনভিত্তিক ছিলো। প্রতিবছর হজ্জের মওসুমে লন্ডন থেকে সৌদী আরব যেতাম। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের দায়িত্বশীল ও ইসলামী ছাত্র সংগঠনের সভাপতি হজ্জ উপলক্ষে যেতেন। ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে মতবিনিময় ও পরামর্শের জন্য আমাদের সমবেত হবার এটাই একমাত্র সহজ সুযোগ ছিলো। মক্কা শরীফে দেওয়ান আবদুল বাসেত আছেন জেনে দেখা করবার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাসা চেনা নেই বলে চিন্তিত হলাম। আল্লাহর মেহেরবানীতে এক নামাযে কাবা শরীফেই দেখা হয়ে গেলো। তিনি এক রকম জোর করেই তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। তাঁর অকৃত্রিম মহব্বত ভুলবার নয়। জানতে চাইলাম, দেশে যাবেন কিনা। বললেন, "সেখানে মনে মোটেই শান্তি পাই না। এখানে দেশের জন্য দোয়া করে শান্তি বোধ করি।" জানতে চাইলাম, সময় কাটে কিভাবে? বললেন, "যেসব বাংলাদেশী ফ্যামিলি এখানে থাকে ওদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা নেই। আরবী ও বাংলা শেখাবার জন্য ছোট্ট একটা স্কুল পরিচালনা করি।"

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতি হজ্জের সময় মক্কা শরীফে তাঁর সাথে দেখা হতো। একবার তিনি দেশে চলে আসায় দেখা হয়নি। এ মানুষটিকে আমি আল্লাহর প্রিয় বান্দা মনে করেই মহব্বত করতাম।

আমার নাগরিকত্ব মামলা যখন হাইকোর্টে চলে তখন আমি জেলে। বেঞ্চের দু'জন বিচারপতি দু'রকম রায় দেওয়ায় তৃতীয় বিচারপতির কোর্টে মামলা চললো। তৃতীয় বিচারপতির রায় আমার পক্ষে হওয়ায় হাইকোর্টে আমি জিতে গেলাম। জেল থেকে বের হবার পর জানতে পারলাম যে, ঐ তৃতীয় বিচারপতি আনওয়ারুল হক চৌধুরী দেওয়ান আবদুল বাসেত সাহেবের জামাতা। আমার মামলায় এ বিচারপতি তৃতীয় জজ হিসেবে নিয়োগের খবর পত্রিকায় পড়ে কয়েকজন জেল কর্মকর্তা আমাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বললেন, "এ বিচারপতির নিকট সুবিচার পাবেন।" এ বিচারপতি সম্পর্কে পূর্বে আমার কিছুই জানা ছিলো না।

নাখাল পাড়ায় জামায়াতের প্রাদেশিক অফিস স্থাপন

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডস্থ জামায়াতের প্রাদেশিক অফিস সরকার সীল করে দেয়। বছর দু'এক পর ঐ ঘরের মালিক তদবীর করে তার মালিকানা বহাল করতে সক্ষম হয়। দু'বছর বেচারা ভাড়া পায়নি। মালিককে ঘর বুঝিয়ে দেবার সময় জামায়াতের বই, ফাইল ও আসবাবপত্র সরকার সরিয়ে নেয়।

১৯৬২ সালের জুনে যখন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয় তখন জামায়াতের প্রাদেশিক অফিস স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাদেশিক আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ১৯৬০ সালে নাখাল পাড়ায় একটি সেমিপাকা বাড়ি কিনে বসবাস করছিলেন। ঢাকা শহর জামায়াতের রুকন জনাব মাহবুবুর রাহমান গুরহা এর আগেই সেখানে বসতি স্থাপন করেন। তিনিই মাওলানাকে বাড়ি কেনায় সহযোগিতা করেন।

তাদের দু'জনের উদ্যোগ ও চেষ্টায় নাখাল পাড়ায় এক খণ্ড জমি কিনে সেমিপাকা ঘর তুলে প্রাদেশিক অফিস স্থাপন করা হয়। আমি সাইকেলে মগবাজার থেকে অফিসে যেতাম। নিকটে কোন মসজিদ না থাকায় একটি কামরা পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্য রাখা হয়। অফিস সেক্রেটারি ছিলেন জনাব মাহবুবুর রাহমান, যিনি বর্তমানে ঢাকার রামপুরা এলাকায় বসবাস করেন এবং হোমিও ডাক্তারি করেন।

ব্যাপক সাংগঠনিক সফর

সামরিক শাসনকালে জামায়াতের নামে প্রকাশ্যে যে কোন কর্মতৎপরতা বেআইনি ছিলো। কিন্তু ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম হিকমতের সাথে পালন করায় একদিকে যেমন সংগঠনভুক্ত সবাই কাজ করার সুযোগ পেয়েছে, অপরদিকে সাংগঠনিক কাঠামোও বহাল রাখা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ইসলামী আন্দোলনের প্রভাববলয় সম্প্রসারিত হয়েছে। ইসলামী সেমিনার, সীরাতুন্নবী সম্মেলন, তাফসীর মাহফিল ইত্যাদির ব্যানারে এ সব আয়োজনে জামায়াতের লোকেরাই উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছে। জামায়াতের সাথে পূর্বে জড়িত ছিলো না এমন অনেক লোক আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। উদ্যোক্তাদের নেতৃত্বে এসব লোক ইসলামের কাজে নিয়োজিত থাকায় পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

জামায়াত নতুনভাবে প্রকাশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করলে দায়িত্বশীলদের সাথে পরিচিত ঐ সব লোককে সহজেই সংগঠনভুক্ত করা গেলো। কয়েক মাসের মধ্যেই সামরিক শাসনের পূর্বের কর্মী সংখ্যার দ্বিগুণ, কোথাও তিনগুণ নতুন কর্মী যোগাড় হলো।

সেমিনার, সম্মেলন ও মাহফিলে জামায়াতের যে কয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দারস ও বক্তৃতা দিয়েছেন, হাজার হাজার শ্রোতা তাদের নাম জেনেছেন ও তাদের বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়েছেন। এ পরিচিত বক্তাগণের নামে জামায়াতের জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সামরিক শাসনের পূর্বের তুলনায় এ সব জনসভায় অনেক বেশি জনসমাগম হতে থাকে।

এ কর্মসূচি সফল করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সেক্রেটারি হিসেবে আমাকে সারাদেশে ব্যাপক সফর করতে হয়। প্রাদেশিক আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম জামায়াতের সাহিত্য উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদে বেশি সময় দিতেন বলে সিদ্ধান্তক্রমেই তাঁর সফর এতো বেশি সম্ভব হয়নি।

লাহোরে নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন ১৯৬৩

সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদীর নির্দেশে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সর্বত্র সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়। ১৯৬২ সালের জুন থেকে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দাওয়াত ও সংগঠন বিস্তার লাভ করতে থাকে। কেন্দ্রীয় জামায়াত ১৯৬৩ সালের আক্টোবরে লাহোরে নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনের আয়োজন করে।

আইয়ূব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জামায়াতের বলিষ্ঠ বক্তব্য ও '৬১ সালে জারি করা ফ্যামিলি ল' অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি করায় আইয়ূব খান জামায়াতের উপর ক্ষিপ্ত হন। তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ খান জামায়াতের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমান্তক বিবৃতি দিতে থাকেন। এ আশঙ্কা দেখা দিলো যে, জামায়াতের সম্মেলন হতে দেবে কিনা।

জামায়াতের পক্ষ থেকে সম্মেলনের জন্য যেসব ময়দানের অনুমতি চাওয়া হয় এর কোনটায়ই অনুমতি দিলো না। জামায়াত লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডি মহাসড়কের পাশে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকায় সম্মেলনের আয়োজন করতে বাধ্য হয়। ঐ স্থানটি প্রস্থে খুব কম থাকায় দৈর্ঘ্যে এতো লম্বা এলাকা জুড়ে তাঁবু খাটাতে হয়েছে। সম্ভবত সরকারের ধারণা ছিলো যে, এমন অবাস্তব ও অসুবিধাজনক স্থানে সম্মেলনের অনুমতি দিলে জামায়াত সম্মেলন করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু জামায়াত যখন সম্মেলনের আয়োজন করেই ফেললো, তখন এটাকে ব্যর্থ করার জন্য সরকার মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করলো।

এ জাতীয় অনুমতি দেবার ইখতিয়ার প্রাদেশিক সরকারের। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশকে 'পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশ' নাম দিয়ে একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়। ঐ সময় সে প্রদেশের গভর্নর ছিলেন আইয়ূব খানের বংশবদ নওয়াব আমীর মুহাম্মদ খান নামক এক বিরাট জমিদার। কেন্দ্রে যেমন প্রেসিডেন্ট আইয়ূব সকল ক্ষমতার মালিক ছিলেন, তেমনি প্রাদেশিক গভর্নরও প্রদেশে পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করতেন।

আমীর মুহাম্মদ খান অত্যন্ত সংকীর্ণমনা ও হিংস্র প্রকৃতির ছিলেন। জামায়াতের প্রতি দুশমনি করার যে নির্দেশ তার প্রভু আইয়ূব খান থেকে পেলেন তা তিনি জঘন্যভাবেই পালন করলেন। জামায়াতকে সম্মেলনের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও মাইক ব্যবহার করার অনুমতি না দেওয়াটা কত নিকৃষ্ট মনের পরিচয় বহন করে তা অনুমেয়।

ঐ সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আমরা মাত্র ১০৩ জন যোগ দিতে সক্ষম হই। সম্মেলনের চিত্র এখনো আমার চোখে ভাসে। সম্মেলনস্থলেই প্রতিটি সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও আমি ঐ পরিষদের সদস্য ছিলাম। গভর্নরের গুণ্ডা বাহিনী যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে বলে আশঙ্কা থাকায় সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও উপজাতি এলাকার স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের লাইসেন্সধারী বন্দুক ও পিস্তল নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন। নিরস্ত্র লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবকগণ বিরাট সম্মেলন এলাকা ঘেরাও করে রেখেছেন। পরিস্থিতি দেখে আমার মনে হলো যেন যুদ্ধের ময়দানে আছি।

সম্মেলন পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন

সম্মেলন সফল করার উদ্দেশ্যে আমীরে জামায়াতের নেতৃত্বে কর্মপরিষদে সিদ্ধান্ত নেবার সময় মাওলানার বিস্ময়কর সাহস ও দৃঢ়তা এবং প্রতিটি সমস্যার কার্যকর সমাধান দেবার যোগ্যতা দেখে আমার অন্তরে প্রত্যয় সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ তাআলা এ মানুষটিকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার যাবতীয় যোগ্যতাই দান করেছেন। কর্মপরিষদের বিভিন্ন বৈঠকে তাঁর প্রস্তাবিত ও কর্মপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. সম্মেলনে হামলা করতে আসলে স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদেরকে ঘেরাও করে পুলিশে সোপর্দ করবেন। নিজেরা তাদেরকে মারবেন না। তাদের উদ্দেশ্য সম্মেলন পণ্ড করা। তাদেরকে মারলেই পুলিশ তাদের পক্ষ হয়ে হামলা করবে। সম্মেলন সফল করতে হলে চরম ধৈর্যের সাথে এ সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

২. সম্মেলনের ডেলিগেটগণ নিজ নিজ প্যান্ডেলে আসন গ্রহণ করবেন। অন্যত্র যা-ই ঘটুক মঞ্চের পক্ষ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সবাই আসনে অবস্থান করবেন। কেউ নিজের সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়ে যাবেন না। সম্মেলনের শৃঙ্খলার জন্য এ নির্দেশ পালন করা বিশেষভাবে জরুরি।

৩. স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ নিজ কমান্ডারদের নির্দেশ ব্যতীত কোন কিছু করবেন না। ডেলিগেটরদের কেউ নিজেই স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করবেন না। স্বেচ্ছাসেবকগণকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোন গ্রুপ নিজেদের দায়িত্বের বাইরে কিছু করবেন না।

এসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মাইক ছাড়াই সংশ্লিষ্ট সবাইকে কেমন করে পৌঁছানো সম্ভব হলো আমার নিকট এখনো তা মহাবিস্ময়। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বৈঠকে আমি ছিলাম বলে আমার সরাসরিই জানা সম্ভব ছিলো। কত বড় সাংগঠনিক শৃঙ্খলা থাকলে এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আমার মনে হয়েছে যে, আমরা যুদ্ধাবস্থায় ছিলাম। মাওলানা মওদূদীর মতো সেনাপতির পক্ষেই এমন জটিল পরিস্থিতিতে নিজের সৈনিকদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা সম্ভব ছিলো।

সম্মেলনের কার্যক্রম

সম্মেলনের প্রথম কাজই ছিলো আমীরে জামায়াতের উদ্বোধনী ভাষণ। তিনি পূর্বের রাতেই ভাষণটি লিখে রাতের মধ্যেই কয়েকশ কপি ছাপিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। সকাল ১০টায় উদ্বোধনী ভাষণ দেবার কথা। ডেলিগেটগণ বিভাগভিত্তিক বিভিন্ন প্যান্ডেলে অবস্থান করছেন। প্রতিটি প্যান্ডেলের মাঝখানে একটা করে টেবিল রাখা হয়। মাওলানার মুদ্রিত ভাষণ টেবিলে দাঁড়িয়ে পড়ে শুনাবার ব্যবস্থা হলো। মঞ্চে যখন মাওলানা ভাষণ দেন সে সময়ই একযোগে সকল প্যান্ডেলে সবাই ভাষণ যাতে শুনতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই এমন অদ্ভুত আয়োজন।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যারা গিয়েছিলাম তাদের সংখ্যা কম হওয়ায় মঞ্চের কাছে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের সাথেই আমাদের বসার ব্যবস্থা হলো। মাওলানা মওদূদীর কণ্ঠের আওয়াজ উচ্চ ছিলো না। মাইক ছাড়া তিনি যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ শুরু করলেন।

কয়েক মিনিট পরই আমাদের বরাবর মহাসড়কের পাশের তাঁবুতে আগুন দেখা গেলো এবং গুলীর শব্দ শুনা গেলো। সম্মেলনস্থলে চলাফেরা করার জন্য যে রাস্তা রাখা হয়েছে, সে রাস্তা ধরে ১০ /১২ জন লোক দৌড়ে মঞ্চের ৪০ /৫০ হাত কাছে এসে হৈ চৈ শুরু করে দিলো। লক্ষ্য করলাম যে, স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদেরকে ঘেরাও করে ঐ রাস্তা ধরেই তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হৈ-হাঙ্গামা করার সময় পাঞ্জাবী ভাষায় একটা কথা শুনা গেলো 'মওদূদী তুসী গাদ্দার এ্যান্থ (মওদূদী তুমি গাদ্দার)।

মাওলানা দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন, মাওলানার নিরাপত্তায় নিযুক্ত ব্যক্তি চিৎকার করে বললেন, 'মাওলানা বসে যান্থ। কিন্তু মাওলানা ভাষণ চালু রাখতে গিয়ে বললেন, "আমিই যদি বসে পড়ি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?" মাওলানা ভাষণদান অব্যাহত রাখলেন।

হাঙ্গামাকারীদেরকে ঘেরাও করে রাস্তায় টহলরত পুলিশের হাতে দেওয়া হলো। যদি এদেরকে মারপিট করা হতো তাহলে সম্মেলন শান্তিপূর্ণভাবে চলতে পারতো না। আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম, যে তাঁবুতে আগুন লাগানো হয়েছিলো, সে তাঁবুর ডেলিগেটরাও অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়নি। স্বেচ্ছাসেবকরা আগুন নিভিয়ে ফেললো। আর সবাই মাওলানার ভাষণ ঐ প্যান্ডেলের পাঠকদের মুখে শুনতে থাকলো।

গুলীর আওয়াজ সম্পর্কে জানা গেলো যে, আল্লাহ বখশ নামে একজন কর্মী শহীদ হয়েছেন। ঘাতককে স্বেচ্ছাসেবকগণ ধরে পুলিশের হাতে দিয়ে দিলেন। শহীদের স্ত্রীও পাশের মহিলা-ক্যাম্পে ছিলেন। স্বামী শহীদের মর্যাদা পাবেন জেনে তিনি একদম শান্ত হয়ে গেলেন বলে শুনেছি। উদ্বোধনী অধিবেশনের পর বিরতির সময় আমি অনুমতি নিয়ে শহীদকে দেখতে গেলাম। সেখানে ভিড় করতে দেওয়া হয়নি বলে সহজেই দেখা গেলো। আমার কান্না এলো এবং মৃদু আওয়াজে কাঁদতে লাগলাম। দুজন আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে কান্না থামিয়ে দিলেন।

আমীরে জামায়াতের নির্দেশে শহীদের জন্য ডেলিগেটদের মধ্য থেকে এক লাখ রুপিয়ার তহবিল সংগ্রহ হয়ে গেলো। তিনি ঘোষণা করলেন যে, এ খুনের মামলা তিনি আল্লাহ তাআলার কোর্টে পেশ করেছেন। আসল বিচার তো আখিরাতেই হবে। দুনিয়াতে গভর্নর আমীর মুহাম্মদ খানের অত্যন্ত অপমানজনক মৃত্যু হয়। তার ছেলেই তাকে হত্যা করে লাশ গ্যারেজে ফেলে রাখে। তার এ পরিণতির কথা জেনে মাওলানা কোন মন্তব্য করেননি।

৯২.

লাহোর সম্মেলনের ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে ঐতিহ্যগতভাবে যেসব কর্মসূচি থাকে এ সম্মেলনে মাইক ব্যবহার করতে না দেওয়ায় সে ধরনের কিছুই করা সম্ভব হয়নি। সম্মেলনে দারসে কুরআন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা, বার্ষিক রিপোর্ট, প্রস্তাবাবলি গ্রহণ ও সমাপনী ভাষণ ইত্যাদি কোনটাই সম্ভব হয়নি। একমাত্র উদ্বোধনী ভাষণ যে অভিনব পদ্ধতিতে পরিবেশন করা হয়েছে, অন্যান্য কর্মসূচি সেভাবে পালন করা একেবারেই অবাস্তব।

তিন দিনব্যাপী সম্মেলন দুদিনেই সমাপ্ত করা হলো। সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সম্মেলনের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক বৈঠক ডাকা হয়, যেখানে সকল জেলার আমীরগণ উপস্থিত হন। আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণের মুদ্রিত কপি জেলা আমীরদের হাতে দেওয়া হয়, যাতে জেলা থেকে আগত ডেলিগেটদেরকে শুনিয়ে দেওয়া যায়।

সম্মেলনের দুদিন রোজ ৪ ঘণ্টা সময় এক ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রথম দিন উদ্বোধনী অধিবেশনের পর এবং দ্বিতীয় দিন সকাল ৯টা থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়। হাজার হাজার ডেলিগেটদেরকে লাহোর শহরে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে যেয়ে দাওয়াত দেবার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৮ /১০ জনের এক-একটি গ্রুপ গঠন করে লাহোর শহরে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমিও এক গ্রুপের আমীর ছিলাম।

সম্মেলন শহরের পাশে মহাসড়কে হওয়ায় শহরবাসীর কৌতূহল তো ছিলোই; সম্মেলনের সাথে সরকারের বৈরী আচরণের কথা পত্রিকার মাধ্যমে অনেকেরই জানা ছিলো। ফলে দাওয়াতী গ্রুপ সর্বত্রই সহানুভূতি পেয়েছে। আমার ছিলো এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। আমরা কোথাও বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। জনগণ আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছে। কোথাও কোথাও আপ্যায়ন করে আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে।

দাওয়াতে আমরা তিনটি কথা বলেছি। জামায়াতে ইসলামী কী চায়? সরকার কেন জামায়াতকে বরদাশত করতে চায় না? জামায়াত যা চায় তা যদি আপনারা চান তাহলে জামায়াতের সমর্থক হোন। দুদিনে লাহোর শহরে মোট দেড় লাখ লোক জামায়াতের মুত্তাফিক (সমর্থক) হন।

গোটা শহরে জামায়াত জনগণের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। সম্মেলনের এ গণ-দাওয়াতের কর্মসূচি

সেক্রেটারি জনাব ফকীর হোসাইন এসে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জানালেন যে, পুলিশের বিরাট বাহিনী জামায়াতের অফিস এলাকা ঘিরে রেখেছে। কর্মকর্তা থেকে জানা গেলো যে, সরকার জামায়াতকে ৬ জানুয়ারি থেকে বেআইনী ঘোষণা করেছে এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সকল সদস্যকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে।

আমার ও মাওলানা আবদুর রহীমের নামও তাদের তালিকায় আছে বলে জানা গেলো। তাই আমরাও জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। ঢাকা থেকে সফরের জন্য যা এনেছিলাম, তা সুটকেসে গুছিয়ে নিলাম।

আমীরে জামায়াতের পক্ষ থেকে পুলিশ কর্মকর্তাকে জানানো হলো যে, ফজরের নামাযের সময় হলেই আমরা জামাআতে নামায পড়ে তাদের গাড়িতে উঠবো। মাওলানার ইমামতীতে নামায হলো। কেন্দ্রীয় অফিসের সবাই জামাআতে শরীক হলেন। মাওলানা পয়লা রাকাআতে সূরা বুরূজ এমন আবেগের সাথে তিলাওয়াত করলেন যে, এখনো এর প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণে আছে। এ সূরার শুরুতে মুমিনদের আগুনে পুড়িয়ে চরম নির্যাতনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মাওলানার মুখে তিলাওয়াত শুনে মনে সান্ত্বনা বোধ করলাম যে, আমি তো শুধু গ্রেপ্তার হচ্ছি। যাদেরকে পুড়িয়ে যালিমরা মজা উপভোগ করেছে তাদের তো এ অপরাধই ছিলো, যে অপরাধে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করছে। ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে জেল পাস করার পর জেলের ভয় তো মনে ছিলোই না; বরং দীনের কারণে গ্রেপ্তার হওয়ায় মনে রূহানী তৃপ্তি বোধ করলাম।

লাহোর জেলে পৌঁছলাম

মাওলানা মওদূদীসহ আমরা ৮ জন লাহোর জেলে পৌঁছলাম। জানুয়ারির প্রচণ্ড শীতে পুলিশের জিপে ওভারকোট গায়ে দিয়েই বসলাম। তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো। ঠাণ্ডা বাতাসে শীতের তীব্রতা বোধ করলাম।

লাহোর জেলের একতলা এক দালানে নিয়ে আমাদেরকে উঠালো। আর যারা আমাদের সাথে ছিলেন তারা হলেন, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, প্রখ্যাত কবি নাঈম সিদ্দিকী, লাহোর শহরের আমীর হাফেয মাওলানা নাসরুল্লাহ খান আযীয, শহর সেক্রেটারি চৌধুরী গোলাম জিলানী ও কেন্দ্রীয় শূরায় লাহোর শহর থেকে নির্বাচিত সদস্য মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ।

ঐ দালানে ৪টি কামরা। একটি কামরায় এটাস্ট বাথরুম ও কমড থাকায় আমীরে জামায়াতের জন্য ঐ কামরাটিই বরাদ্দ করা হলো। জেলের ডাক্তার ছাত্র জীবনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন বলে আমাদের সাথে খোলামেলা আলাপ করতেন। তার কাছ থেকে জানা গেলো যে, এ কামরায় অনেক রাজনৈতিক নেতা

বিভিন্ন সময় ছিলেন। তিনি দুজনের নাম বললেন, সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত খান আবদুল গাফফার খান ও সীমান্ত প্রদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খান আবদুল কাইয়ুম খান।

এর পাশের কামরায় আমি, মাওলানা আবদুর রহীম ও মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ এবং বাকি দুকামরায় দুজন করে রইলেন। কয়েক দিন পর মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদকে মুলতান জেলে অপসারণের পর মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ মিয়া সাহেবের স্থানে চলে গেলে আমরা দুজন করে প্রতি কামরায় রইলাম।

রাতে প্রত্যেক কামরায় তালা লাগানো হতো না। বারান্দায় লোহার সিক দেওয়া ছিলো। তাতেই তালা লাগানো হতো। তাই আমরা ৪ কামরার সবাই রাতেও জামাআতে নামায আদায় করা, একসাথে খাওয়া, বারান্দায় পায়চারি করা, অবাধে আলাপ-সালাপ করার সুযোগ পেতাম।

মাওলানার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দুমাস

৬ জানুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ণ দুমাস লাহোর জেলে ছিলাম। মাওলানা মওদূদীর দুর্লভ সান্নিধ্য আমার জীবনের এক বিরাট অর্জন। মজলিসে আমেলার বৈঠক শেষে ঢাকা ফিরে আসার কথা ছিলো। লাহোরে আটক হয়ে পড়ায় প্রথম কদিন খারাপই লেগেছে। কিন্তু মাওলানার সাহচর্যে কয়েকদিন পরই অনুভব করলাম যে, এটা আমার জন্য এক মহাসুযোগ। জেল ছাড়া এমন সুযোগ পাওয়া আর কোনভাবেই সম্ভব হতো না।

কিছুদিন পর জনাব নাঈম সিদ্দীকীকেও অন্যত্র নিয়ে যাবার পর আমরা ৬ জন একসাথে ছিলাম। আমাদের ২৪ ঘণ্টার রুটিন ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১. মাওলানার কামরায় ফজরের জামাআত। শীতের রোদে যোহর ও আসরের জামাআত। মাগরিব ও ইশার জামাআতও মাওলানার কামরায়। আমি মুয়ায্যিন আর মাওলানা ইমাম।

২. সকাল আটটার পর নাস্তা ও যোহরের একঘণ্টা পর দুপুরের খাবার বারান্দায় একসাথে। আর রাতের খাবার শীতের কারণে মাওলানার কামরায়।

৩. যোহরের নামাযের পর মাওলানা দারসে কুরআন পেশ করতেন। আর আসরের পর, কোন দিন মাগরিবের পর দারসে হাদীস দিতেন।

৪. ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মাওলানা বাইরে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে রোদ উপভোগ করতেন। এ সময় অনুমতি নিয়ে পাশে চেয়ারে বসে মাওলানার সাথে কথা বলার সুযোগ নিতাম। আমি প্রশ্ন করতাম, আর তিনি জওয়াব দিতেন।

আমার আগ্রহ দেখে তিনি দরদের সাথেই জওয়াব দিয়ে আমাকে তৃপ্ত করতেন। মনোযোগী ছাত্র পেলে ভালো শিক্ষক যেমন যত্নের সাথে শেখাবার চেষ্টা করে, মাওলানা তেমনি আচরণ করতেন। আমার প্রশ্নের বিষয়ের কোন সীমাসংখ্যা ছিলো না। ইসলাম, কুরআন, হাদীস, রাসূল (স), ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী আন্দোলন, দেশের রাজনীতি, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ, বিশ্ব পরিস্থিতি, জামায়াতের সাংগঠনিক বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আমি প্রশ্নের তালিকা তৈরি করে নিতাম। আমার প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কোন ইস্যু তিনি নিজেও তুলতেন।

উপর্যুক্ত সব বিষয়েই মাওলানার লেখা প্রচুর বই পড়েছি। কিন্তু শুধু বই পড়ে পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। পড়ার সময়ও মনে প্রশ্ন জাগে। বইকে তো প্রশ্ন করা যায় না। মাওলানার সান্নিধ্য পেয়ে আমি অনুভব করলাম যে, শুধু বই-ই যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন করে মনের খোরাক পাওয়ার মতো জ্ঞানীর সঙ্গ না পেলে মন তৃপ্ত হয় না। শুধু বই পড়েই যদি জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা কিতাব নাযিল করাই যথেষ্ট মনে করতেন, নবী পাঠাবার প্রয়োজন বোধ করতেন না। কিতাব ও নবী দুটোই আবশ্যক।

মাওলানার দারস

দারসে কুরআনের সময় মাওলানা কুরআন শরীফের ব্যক্তিগত কপি সামনে রাখতেন। মোটা কাপড়ে মোড়ানো বিরাট গ্রন্থটি কাছে থেকে দেখলাম। কুরআনের আয়াতের তিন পাশে (উপরে, নিচে ও পাশে) ৪ /৫ ইঞ্চি প্রশস্ত খালি জায়গা। ফরমাশ দিয়ে তৈরি করা কিনা জানি না। ঐ খালি জায়গা সবটুকু ছোট অক্ষরে হাতের লেখায় পূর্ণ। বিভিন্ন তাফসীর অধ্যয়ন করে পয়েন্ট নোট করে রেখেছেন। এটা নিশ্চয়ই দীর্ঘ সাধনার ফসল। তাফহীমুল কুরআন রচনার জন্য এভাবে তিনি প্রস্তুতি নেন।

হাদীসের দারসের জন্যও তিনি একটি গ্রন্থ সামনে রাখতেন। উভয় দারসের পর তিনি ঐ সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নের জওয়াব দিতেন। দারসের এ মাহফিল আমার নিকট সব চাইতে আকর্ষণীয় মনে হতো।

জেলে আমার ব্যক্তিগত কর্মসূচি

সামষ্টিক রুটিনের বাইরে আমার মাত্র দুদফা নিয়মিত কর্মসূচি ছিলো। একটা হলো তাফহীমুল কুরআন পড়া, অপরটি হলো বাছাই করা সূরাগুলো মুখস্থ করা। মাঝে মাঝে জেল লাইব্রেরী থেকে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বই নিয়ে পড়েছি।

জেলে আলো কম থাকায় রাতে পড়া কষ্টকর ছিলো। তাই কুরআনের যেটুকু মুখস্থ করা হতো তা রাতে বারান্দায় হেঁটে হেঁটে আওড়ায়ে সময়টা কাজে লাগাতাম। কুরআন মুখস্থ করার চেয়ে মুখস্থ রাখাই বেশি কঠিন। তাই বেশি বেশি সময় নিয়ে